**দুধ**

**মশিউল আলম**

একবার মাঘ মাসে খুব বন্যা হয়েছিল

—জনশ্রুতি

সলিমুদ্দির বউ জুলেখা বাচ্চা বিয়োল বটে, কিন্তু মাস দুয়েক যেতে না যেতেই তার বুকের দুধ সব ফুরিয়ে গেল। বাচ্চাটা এখন কী খেয়ে বাঁচে? জুলেখার এই নিদারুণ প্রশ্নের কোনো জবাব নাই। যিনি আসমান-জমিনের মালিক, জুলেখার বিশ্বাস, তার বুকের দুধের মালিকও তিনিই। কিন্তু সে-মহাজন জুলেখা ও তার বাচ্চাটার এরকম বেকায়দা অবস্থা দেখে মুখ টিপে হাসেন বলে এখন জুলেখার মনে হয়। তাই ভীষণ রাগ লাগে তার। খোদা বড়ই খামখেয়ালি—এই কথা তার বুকের মধ্যে বেজে চলে। না পেরে একদিন বাচ্চাটাকে বুক থেকে সরিয়ে রেখে সে আসমানে তাকিয়ে বলেই ফেলল, ‘কামটা তুই ভালো করলু না খোদা!’

কিন্তু এই জুলেখার বুকের ভিতরে নাকি আরও এক জুলেখার বাস। সে তর্জনী তুলে বলে, আল্লার কেরামতি বুঝবার চ্যাষ্টা করিস না। তাতেই কিন্তু বেশ আতঙ্ক বোধ হলো জুলেখার, নিজের বুকে থু থু ছিটিয়ে তওবা কাটল সে। কিন্তু তবুও তার ক্ষমা মিলল না, দেখা দিল ভয়ানক পেটের পীড়া। হেগে-মুতে-বমি করে সে ভাসিয়ে দিল ঘর-বাড়ি-আঙিনা।

তবে মধুপুরের লোকেরা জানে আসমান-জমিনের মালিক অসীম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি খাওয়ার স্যালাইনের প্যাকেট হাতে এনজিওকর্মী আমিনুল ইসলামকে জুলেখার শয্যাপাশে পাঠিয়ে দিয়ে আজরাইল ফেরেশতাকে এবারের মতো ফিরে যাবার হুকুম দিলেন।

রাশি রাশি খড়ের স্তূপ ও গাদার গোলকধাঁধার মধ্যে বাচ্চাহারা কুকুরটি ও জুলেখার ছেলে বিস্ময়করভাবে পরস্পরকে খুঁজে পায়।

২.

জুলেখা বাদশার মেয়ে নয়। মধুপুর গ্রামের তালুকদারদের বাড়িতে সে সংবৎসরের বাঁধা কিষানি। তার স্বামী সলিমুদ্দিও তাই [বাঁধা গাই-বলদ আর বাঁধা কিষান-কিষানিতে তফাত নাই]।

জুলেখার বয়েস ২৪, চামড়ার রঙ পুরাতন ছাতার কাপড়ের মতো কালো, শরীরে মাংসের আকাল। গিঁটসর্বস্ব, কঞ্চির মতো চিকন, হ্যাঁকাব্যাঁকা ও দীর্ঘ তার শরীর। নাক হাড্ডিময় ও চোখা, চোয়াল উদ্যত। চোখ দুটি ছোট ছোট; ছায়াময় দুটি গর্ত আছে তাদের তলদেশে। সেগুলি মরচে-পরা কালো কালো দুটি কাস্তের মতো। জুলেখার বুক নারীদের বুকের মতো যথেষ্ট স্ফীত নয়। তার কোমর চ্যাপ্টা ও সরু। নিতম্ব দরিদ্র।

৩.

জুলেখার বুকে দুধ নাই। কিন্তু আল্লার রহমতে তার ছেলেটা দুধের অভাবে মরে নি। বহাল-তবিয়তে আছে সে, বড় হচ্ছে। গেরস্তবাড়িতে ভাতের মাড় দুর্লভ বস্তু নয়। তা ছাড়া লোকেরা তাকে মাটির ঢেলাও খেতে দেখেছে। অর্থাৎ কিনা, ভাতের মাড় ও মাটির ঢেলা খেয়ে জুলেখার ছেলেটা বড় হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নাই। এখন সে হামাগুড়ি দিয়ে চলে; দাঁড়াতেও পারে এটা-ওটা অবলম্বন করে। তালুকদার-বাড়ির উঠানে-বারান্দায়-চুলাপাড়ে-গোয়ালঘরে হামাটানা এই শাবকের বিচরণ অতি স্বচ্ছন্দ। কচি লালচে জিবটাকে সে তার সদ্য-গজা দুখানা দাঁতের পশ্চাৎ-দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ত ত ত ধ্বনি তোলে। মধুপুরে এমন কেউ নাই যে তাকে একটুখানি আদর করে কোলে তুলে নেবে, একটু দোলাবে, হাসাবে-কাঁদাবে। কিন্তু সে জন্য তার কিছু যায়-আসে না। সে আপন মনে থাকে, হামাগুড়ি দিয়ে এখানে-ওখানে যায়, এটা-ওটা ছোঁয়, ভেড়া-ছাগলের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করে আর যখন-তখন হেসে ওঠে খলখল শব্দে।

৪.

পৌষের রাতে মধুপুরের উত্তর পাথার বেয়ে শীতের বাতাস হি হি করে হাসতে হাসতে হিম দাঁতগুলো বের করে এসে কামড়ে ধরে গোটা গ্রামটাকে। কালো আকাশ থেকে হিম শিশির ঝরে পড়ে টিন ও খড়ের চালে, গাছের পাতায়, খড়ের গাদায়, শুয়ে-থাকা ধানক্ষেতে, ধুলাময় পথে ও শক্ত মাঠে। তালুকদার-বাড়ির গোয়ালে গরুরা ঠান্ডায় কাঁপে, ডাঁশ-মশা তাদের রক্ত পান করে ঢোল হয়ে পড়ে থাকে। এক সময় গাছের কোটর থেকে একটা পেঁচা তার বিদঘুটে মুখ বের করে কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরকে দেখে। গ্রামের মসজিদে বুড়া মুয়াজ্জিন কম্পিত স্বরে আজান দিয়ে ওঠে, আর তালুকদারদের অনেক গোয়ালের একটার ভিতরে খড়ের গাদায় একটা কালো কুকুর তার বেঢপ পেটটা খালাস করে দিয়ে ৫টি বাচ্চাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। তখনও পুবের আকাশে সূর্যের কোনো আভাস নাই। তখনও তালুকদার-বাড়ির খলায় টিন দিয়ে ছাওয়া টোলের মধ্যে রাশি রাশি খড়ের ভিতরে কালো কালো একদল মানুষ ভোঁস ভোঁস শব্দ করে ঘুমায়।

৫.

কালো কুকুরের বাচ্চারা এখনো চোখ মেলতে পারে না। পৃথিবীর আলো সহ্য হয় না তাদের। তারা কুঁইকুঁই শব্দ করে আর একে অপরের গায়ে কেবলই ঢলে ঢলে পড়ে। মায়ের ওলানের বোঁটাও তারা নিজে থেকে খুঁজে পায় না।

দুধে ফেটে যায় মায়ের ওলান। কিন্তু পেট তার ক্ষুধায় জ্বলে। বাচ্চাদের পেট ভরে খেতে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। তার নিজের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খড়ভরা গোয়াল ছেড়ে আঙিনা পেরিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে পাতাঝরা বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে সে তার দুধভর্তি ওলান দোলাতে দোলাতে যায় খাদ্যের সন্ধানে।

৬.

একটা দশাসই মর্দা কুকুর এসে দাঁড়ায় গোয়ালের সামনে। খাড়া হয়ে ওঠে তার ঝুলেপড়া দুই কান। নাকের ফুটোদুটি একবার সংকুচিত, একবার প্রসারিত হতে থাকে। গোয়ালের ভিতরে অস্ফুট কুঁইকুঁই শব্দ। নেকড়ের মতো দশাসই কুকুরটি সাত করে ঢুকে পড়ে গোয়ালে। নিমেষের মধ্যে বেরিয়ে আসে তেমনি তিরের বেগে। এবার দুপুরের ঝকঝকে রোদে দেখা যায় তার মুখে ধবধবে শাদা একটি কুকুরছানা। লাল টকটকে রক্ত টপাটপ ঝরে পড়ে শুকনো মাটিতে। মাটি চোঁ করে শুষে নেয়, তবু দাগ মেশে না।

মুখে বাচ্চাসমেত কুকুরটি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার পর কিছুক্ষণ চারিদিকে সুনসান নীরবতা। মধুপুরের সব নারী ও পুরুষ ধান কাটা-মাড়াই-সেদ্ধ-ভানার কাজে ভয়ানক মশগুল। সুতরাং কিছুক্ষণ পরেই গোয়ালের সামনে এক পাল রাক্ষুসে কুকুরের আবির্ভাব ঘটে এবং মুহূর্তে শূন্য হয়ে যায় কালো কুকুরের বাসাটি। শুধু ফোঁটা ফোঁটা রক্তের বিভিন্নমুখী নকশা আঁকা হয়ে থাকে পৌষের শক্ত ও শাদা মাটিতে। শুকনো তৃষ্ণার্ত মাটি সব রক্ত শুষে নিয়েও সব চিহ্ন মুছে ফেলতে পারে না।

বাঁশঝাড় থেকে ফিরে আসে মা-কুকুর। কোথাও সময় নষ্ট না করে ঢুকে পড়ে গোয়ালে। কিন্তু গোয়ালের ভিতরে তার বাসাটি শূন্য। ছটফট করে ওঠে সে। চারটি পায়ের নখরে ওলট-পালট করে খড়ের গাদা। তার পর মাটি আঁচড়ায়, খড় বিছড়ায়, দিশাহারা হয়ে গোয়ালের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ছুটাছুটি আরম্ভ করে দেয়। তার পর বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে সামনের দুই পা তুলে দীর্ঘস্বরে উ উ উ শব্দ করে। ফের মাটি

আঁচড়ায়, গড়াগড়ি খায়, হাঁপায়, আবার সামনের দুই পা আকাশে তুলে উ উ উ শব্দ করে কাঁদে, কেঁদে চলে।

মধুপুরের মানুষ এইসব দেখে না। সংসারে এর চেয়ে ঢের দরকারি কাজ রয়েছে তাদের।

৭.

জুলেখার ছেলে হামা টেনে টেনে ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়ি-আঙিনা-খলা। মধুপুরে ধানকাটা চলে : ফাঁকা হতে থাকে মাঠ, ধানে আর খড়ে ভরে ওঠে গেরস্তদের ঘর-বাড়ি-উঠান-গোলা।

জুলেখা দিনের বেলা ধান শুকায় গোবরলেপা লাল আঙিনায়, ছড়ানো ধানে পায়ের পাতা ডুবিয়ে ঘুরে ঘুরে ‘পা দেয়’। বিকালে যখন রোদ লাল হয়ে মরে আসে তখন বিছানো ধান সে পাউরা দিয়ে টেনে টেনে স্তূপীকৃত করে। রাতে শিশিরে যেন ভিজে না যায় সে জন্য সারের বস্তার পলিথিন আর চট দিয়ে ঢেকে রাখে ধানের স্তূপ। রাত নামলে সে বড় বড় পিতলের ডেকচিতে ধান সেদ্ধ করে পাঁচমুখো চুলায়। ধানের কুড়ো ছিটিয়ে দেয় চুলার ভিতরে, পটপট শব্দ করে জ্বলে সেগুলি।

সলিমুদ্দি আর-সব কামলাদের নিয়ে দিনে ধান কাটে, ভারে করে আঁটিবাঁধা ধান নিয়ে আসে খলায়, সেখানে পালা সাজায়। রাতে শূন্য ড্রাম আর কাঠের তক্তা বিছিয়ে ধানের আঁটি পেটায়, অথবা গরু-মোষের পিছে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে ‘মাড়া দেয়’—ধান মাড়াই করে।

জুলেখার ছেলেটা এই তুমুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে নিতান্তই অবহেলিত, ঘুরে বেড়ায় একা একা।

বাচ্চাহারা কুকুরটা একলা বসে থাকে গোয়ালের সামনে। তার দুই চোখে পানির দাগ।

জুলেখার ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে যায় কুকুরটির কাছে। কুকুরটি লেজ নাড়ায়, গলা বাড়িয়ে মানুষের বাচ্চাটার ঘ্রাণ নেয়।

৮.

একদিন দুপুরে পাশের বাড়ির মণ্ডলদের কাজের ছেলে আবদুলের চিৎকার শোনা গেল। তারপর দেখা গেল, সে লাফাতে লাফাতে নিজের দুই নিতম্বে চাপড় মারতে মারতে বলে বেড়াচ্ছে : ‘কী তাজ্জব কথা বাহে, কী তাজ্জব কথা! জুলেখার ব্যাটা বলে কুত্তার দুধ খায়!’

লোকজন তার কথা শুনে তাজ্জব। যে যার হাতের কাজ ফেলে ছুটে গেল তালুকদারদের খলায়। সেখানে একটা খড়ের স্তূপের পাশে তারা দেখতে পেল জুলেখার ছেলে ও বাচ্চাহারা কুকুরটাকে : নিরাপদে নির্বিবাদে খেলাধুলা করছে দুটিতে। তাদের এই অনাবিল খেলার মধ্যে আবদুলের অভিযোগের সত্যতার ইঙ্গিতমাত্র কেউ দেখতে পেল না। ফলে একজন আবদুলের ঘাড়ে একখানা থাপ্পড় কষিয়ে বলল, ‘শালা গোয়েন্দাগিরি শিখিছু খুব?’ আবদুল মাটি ছুঁয়ে মায়ের কসম খেল, আল্লার কিরা খেয়ে বলল, ‘মুঁই লিজের চোখে দেখিছুঁ বাহে!’ তখন আরও একটা থাপ্পড় তার দিকে উদ্যত হলে সে অতিশয় বেজার হয়ে বলল, ‘একদিন তোমরা লিজের চোখেই দেখবা পাবিন, মুঁই মিছা কতা কঁওনি।’

৯.

আবদুল পণ করে, আর কাউকে না হোক, অন্তত জুলেখা ও সলিমুদ্দিকে একদিন সে এই তাজ্জব ঘটনা দেখাবেই দেখাবে। সেই থেকে সে তক্কে তক্কে থাকে। কয়েক দিন নিয়মিত অনুসন্ধানের পর সে লক্ষ করে, সকালে পান্তা খাওয়ার পর কামলা-কিষানেরা যখন ধান কাটতে মাঠে চলে যায়, কিষানি ও গেরস্তদের বউ-মেয়েরা ডুবে যায় বাড়ির অন্যান্য কাজে-কর্মে, তখন জুলেখার ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আপন মনে ত ত ত শব্দ করতে করতে সবগুলো চৌকাঠ ডিঙিয়ে চলে যায় বাইরের খলায়। সেখানে রাশি রাশি খড়ের স্তূপ ও গাদার গোলকধাঁধার মধ্যে বাচ্চাহারা কুকুরটি ও জুলেখার ছেলে বিস্ময়করভাবে পরস্পরকে খুঁজে পায়।

জ্যোৎস্নায় প্রহেলিকাময় হয়ে ওঠে চরাচর। এক রহস্যময় নির্মম জীব হিম ছড়াতে থাকে চারিদিকে। মধুপুরের কোথাও কোনো শব্দ নাই।

একদিন আবদুল হাতে-পায়ে ধরে জুলেখা, সলিমুদ্দি ও আরও জনাতিনেক কামলা-কিষানিকে ডেকে আনল খলায়। একটা উঁচু খড়ের স্তূপের আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে পেল :

জুলেখার ছেলেটা খড়ের গালিচায় মচমচ শব্দ তুলে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছে দুধেল কুকুরটি। তার ভারি ফুর্তি, সে খড় আঁচড়াচ্ছে, লেজ নাচাচ্ছে আর অদ্ভুত কুঁইকুঁই ধ্বনি করছে। কুকুরটির গায়ে ছেলেটি যখনই হাত বুলাতে চাইছে, তখনই সে ছল করে সরে যাচ্ছে দূরে, আবার একটু পরেই কাছে এসে লেজ নাচাচ্ছে, ডাকছে মাথা ঝাঁকিয়ে। আর তাইতে খিলখিল করে হেসে উঠে জুলেখার ছেলে হাত বাড়াচ্ছে আবার তাকে ধরার জন্য, কিন্তু আবার সে সরে যাচ্ছে দূরে।

এইভাবে ছলচাতুরি খেলা চলল কিছুক্ষণ। তারপর কুকুরটি একসময় শান্ত হয়ে এল। ছেলেটি ত ত ত করতে করতে চলে এল তার কাছে। কুকুরটি চার পা ছড়িয়ে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। জুলেখার ছেলে তার ছোট্ট পা’দুটি পাশাপাশি জড়ো করে কুকুরটির পেটের নিচে আড়াআড়ি ছড়িয়ে দিয়ে দুহাতে ভর দিয়ে বসল, তারপর ঘাড় বাঁকা করে মুখ তুলল উপরের দিকে, মুখ লাগাল দুধে পরিপূর্ণ ওলানের বোঁটাগুলোর একটিতে।

খড়ের পালার আড়াল থেকে সাত করে বেরিয়ে এল সলিমুদ্দি। কাঁধের কোদালটি দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরে মাথার উপরে তুলে মেরুদণ্ড পিছনের দিকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে আঘাত হানতে উদ্যত হলো। কুকুরটি আতঙ্কে লাগাল দৌড়, কিন্তু একটা খড়ের স্তূপের বাধা পেয়ে অন্য দিকে ঘুরে দৌড় দিতেই সলিমুদ্দির হা-করা মুখ থেকে হাক শব্দে বায়ু বেরিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কোদালের মোটা-সোটা ভারি ঘাড়টা গিয়ে পড়ল কুকুরটার মাথার ঠিক মাঝখানে। পাকা বেল ফাটার শব্দের মতো একটা শব্দ হলো, আর জিবে কামড় দিয়ে কুকুরটা কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল।

সলিমুদ্দি দেখতে পেল, মাথার চারপাশে লক্ষ লক্ষ জোনাকি দুপুরের রোদে অসম্ভব ঝলকানি মেরে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে। সবাই যখন কুকুরটির অন্তিম দেহ-সঞ্চালনের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে, তখন সলিমুদ্দির শিথিল মুঠি থেকে কোদালটি প্রায় নিঃশব্দে খসে পড়েছে খড়ের উপর; আর মাথার চারপাশে বৈরী জোনাকিদের ঝলকানিসহ চক্কর-মারা এক মুহূর্ত দেখার পরেই তার চোখদুটি আস্তে বুজে এল; মৃদু একটা টাল খেয়ে তার দেহকাণ্ডটা আলগা হয়ে যেতেই কামলাদের চোখ পড়ল তার দিকে। গোড়া-কাটা কলাগাছের মতো সলিমুদ্দির দেহটা পড়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় তারা তাকে ধরে ফেলল। তা দেখে জুলেখা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলে পুকুরপাড়ের আমগাছে

সমস্বরে চিৎকার জুড়ে তিনটা কাক আর জুলেখার ছেলেটা কান্না ভুলে অবাক চোখে তাকাল কাকেদের দিকে।

১০.

পৌষ মাসের পুকুরের ঠান্ডা পানি সলিমুদ্দির মাথায় কিছুক্ষণ ঢালার পরে তার হুঁশ ফিরে আসে। প্রথমে সে অবাক হয়ে এপাশে-ওপাশে তাকায়, গাছপালার শাখাপ্রশাখা দেখে। নিজের অবস্থানের হদিস পেলে তাকে ফের স্বাভাবিক দেখায়।

আরও ঘণ্টাখানিক শুয়ে থেকে আরাম করার পরে সে ‘কেছু হয় নি বাহে’ বলে উঠে দাঁড়ায়। এক খামচি সরষের তেল মাথায় ফেলে ডান হাতের তালু দিয়ে চাঁদি ঘষতে ঘষতে লুঙ্গি-গামছা কাঁধে নিয়ে দিব্যি হেঁটে গিয়ে পুকুরে ‘ডুব দিয়ে’ আসে।

তারপর দক্ষিণে ঢলে-পড়া শীতের সূর্যের মিঠা রোদে পিঠ পেতে দিয়ে উঠানে অন্য কিষানদের সঙ্গে বসে পেট ভরে ভাত খায়; ভাত খাওয়া শেষে প্রতিদিনের মতো ঢকঢক করে প্রচুর পরিমাণ পানি পান করে। তরমুজের বড় আর টানটান হয়ে ওঠা পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বিড়ি ধরায়; বিড়িতে সুখের টান দিয়ে গল্প করে।

দুপুরের খাওয়ার পর একটুখানি জিরোবার সামান্য সময়টুকু ফুরিয়ে গেলে সলিমুদ্দি আর-সব কিষানদের সঙ্গে ঠিকঠাক মাঠে যায় ধান কাটতে।

১১.

তারপর শীতের সূর্য ক্লান্ত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে দ্রুত। সোনালি মাঠে কিষানদের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে ফিকে হয়ে এক সময় মিলিয়ে গিয়েছে। শুকনো খড় শিশিরে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছে আর উত্তরের প্রান্তর থেকে শীত তার দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে হাসতে এসে কামড়ে ধরেছে মানুষের চামড়া-হাড্ডি। প্রান্তর ও লোকালয় চুপ মেরে গিয়েছে শীতের ভয়ে। গ্রামের মসজিদের মিনার থেকে আজানের ধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গিয়েছে শীতের আকাশে। কিষানেরা ধান নিয়ে ফিরে গেছে ঘরে। এই ঘর তাদের নিজেদের নয়; এই ধানও নয় তাদের নিজেদের। রংপুর, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, গোবিন্দগঞ্জ থেকে আসা এইসব কালো কালো মানুষ প্রতি বছর ধান কাটার মৌসুমে এ-অঞ্চলে আসে কাজের খোঁজে। গেরস্তদের জমিতে তারা ধান কাটে, গেরস্তদের উঠানে টিন-ছাওয়া টোলের মধ্যে খড় বিছিয়ে ঘুমায়, কাঁচা সবুজ লঙ্কা আর খেসারি কলাইয়ের ডাল দিয়ে শাদা শাদা ভাত খায়, ধান কাটে, ধান মাড়াই করে। চাঁদের আলোয়, ঘোর কৃষ্ণ অমাবস্যার অন্ধকারে শিশিরে ভিজতে ভিজতে তারা ধান মাড়াই করে আর গান গায়।

১২.

কিষানেরা এখন উঠানে সারি বেঁধে বসে ভাত খাচ্ছে। গামলার পর গামলা শাদা ভাত তারা খেয়েই চলেছে। তাদের খাওয়া যেন শেষ হতে চায় না। তারা বুঝি খুশি হয় যদি এইভাবে খাওয়া চলতে থাকে অনন্তকাল। তারা থামতে চায় না, শুধু খেতে চায়, আরও খেতে চায়।

কালো আকাশ থেকে শিশির ঝরে পড়ে কিষানদের মাথায়। তারা কখনো হঠাৎ আকাশের কথা ভাবে, আকাশকে তারা বলে আসমান। তারা আসমান পানে চায় সাধারণত ঝড়-বৃষ্টির খোঁজ নিতে। আর খুব কদাচিৎ অন্য অর্থে আসমানের কথা ভাবে : সেখানে দুজাহানের মালিকের আরশ হয়, মালিক অসীম মেহেরবান হওয়া সত্ত্বেও

কখনো কখনো ভয়ানক গজব নাজিল করে থাকে, মালিকের কেরামতি বোঝা মানুষের সাধ্য নয়।

কিষানেরা ভাত খেয়ে আর পানি খেয়ে আর তামাকের ধোঁয়া খেয়ে তাদের পেটগুলিকে তরমুজের মতো করে তোলে, আহ্ ধ্বনি তুলে তৃপ্তি জানায়, আর গল্প করে বসে বসে। তার পর কানে-মাথায় গামছা বেঁধে শূন্য ড্রাম আর কাঠের তক্তা বিছিয়ে ঠ্যাস ঠ্যাস থপাস থপাস থিপিস থিপিস শব্দে ধানের আঁটিগুলি পেটাতে থাকে। এইভাবে রাত আরও গভীর হয়ে আসে। গাঢ় হয়ে শিশির জমে ওঠে টিনের চালে, খড়ের গাদায়, বাঁশের ঝাড়ে, গাছের পাতায়। পেঁচা ডাকে, দূর থেকে ভেসে আসে শিয়ালের হুক্কা হুয়া, গলির মোড়ে কেঁদে ওঠে কুকুর।

এক সময় চুলার পাড় থেকে জুলেখারও উঠে আসার সময় হয়। ধানের কুঁড়া তখনও চুলার ভিতরে ডিমের কুসুমের রঙ নিয়ে ধিকিধিকি জ্বলছে। সলিমুদ্দি তার সঙ্গীদের কাছ থেকে চলে আসে নিজের ঘরে। এ-বাড়ির সংবৎসরের বাঁধা কিষান হিসাবে তার ও তার পরিবারের জন্য আলাদা একটা ঘর আছে। সে-ঘরে চৌকি নাই বটে, তবে খেজুর পাতার বিছানা আছে, আর এখন অঢেল খড়ের গদির উপর সেই বিছানা বিছানোর ফলে মনে হয় বেশ উষ্ণ আর স্প্রিং-করা গদি আছে তাদের।

সেই গদিতে ঘুমাচ্ছে তাদের ছেলেটি। কাজকর্ম সেরে সলিমুদ্দি আর জুলেখা ঘরে এসে দরজায় খিল এঁটে শুয়ে পড়ে। তারপর আকাশে চাঁদ ওঠে। জ্যোৎস্নায় প্রহেলিকাময় হয়ে ওঠে চরাচর। এক রহস্যময় নির্মম জীব হিম ছড়াতে থাকে চারিদিকে। মধুপুরের কোথাও কোনো শব্দ নাই। পেঁচা আর ডাকছে না, থেমে গেছে শিয়ালের হুক্কহুয়া, নাই কোনো কুকুরের আর্তনাদ।

শুধু সীমাহীন নৈঃশব্দ্যে গম্ভীর শীতের মধ্যে পড়ে পড়ে কাঁপছে মধুপুর।

তারা আসমান-জমিনের মালিকের গূঢ় কেরামতি বোঝার জন্য বুকের ভিতরে অসহায় ও করুণ আকুতি বোধ করে। বুক তাদের কাঁপে, তাদের শঙ্কা বোধ হয়।

১৩.

শেষরাতে সমস্বরে শোরগোল তুলে জেগে ওঠে মধুপুরের মানুষ। চন্দ্রালোকিত চরাচর দূরাগত এক গম্ভীর শব্দে নড়ে ওঠে, দুলে ওঠে। মানুষ নিজ নিজ ঘর-দুয়ার-বারান্দা-আঙিনা-খলায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায় এক সর্বব্যাপী ঢল। চারদিকের প্রান্তর ছাপিয়ে ফুলে-ফেঁপে বেড়ে উঠতে থাকে সেই ঢল। দেখতে দেখতে বাঁশঝাড়, পুকুরঘাট, অলিগলি ডুবিয়ে বেড়ে ওঠে ঢলের তরল। গেরস্তের আঙিনা-খলা ছাপিয়ে সে তরল ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতরে। লোকেরা তখন খড়ের গাদায়, ধানের পালায় আর ঘরের চালে উঠে যেতে থাকে।

তারা দেখতে পায় দুধের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে দুনিয়া। চাঁদের ধবল আলোয় আর দুধবন্যায় প্লাবিত হচ্ছে চরাচর। তারা সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চায়, কিছুই বুঝতে পারে না, তারা আসমান-জমিনের মালিকের গূঢ় কেরামতি বোঝার জন্য বুকের ভিতরে অসহায় ও করুণ আকুতি বোধ করে। বুক তাদের কাঁপে, তাদের শঙ্কা বোধ হয়। তারা ঘরের চালে, ধানের পালায় ও খড়ের স্তূপের শীর্ষবিন্দুতে অথবা গাছের মগডালে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায়, তারা মনে মনে তালাশ করে সলিমুদ্দিকে, তার ছেলেটির কথা তাদের মনে পড়ে এবং তাকে দেখার জন্য তাদের ঔৎসুক্য বোধ হয়।

তারপর অকস্মাৎ এক অশ্রুতপূর্ব কলহাস্যধ্বনি তাদের কানে আসে : দুগ্ধপ্লাবিত নিঃশব্দ চরাচরে তারা একটি শিশুর অনির্বচনীয় কলহাস্য এমনভাবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে শোনে, যা তাদের সমুদয় পূর্বাভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যায়। তারপর তারা দেখতে পায়, দুধের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে গ্রামের অলিগলি, আঙিনা-খলা, পকুরপাড়, বাঁশঝাড়; ধূমায়িত দুধ আর কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে আসমানের দিকে।

এই অদৃষ্টপূর্ব ধবল পটভূমিতে মধুপুরের লোকেরা দেখতে পায় : জ্যোৎস্নালোকিত দুধের সাগরে মহা-উল্লাসে সাঁতার কাটছে সলিমুদ্দির ছেলেটা; তার পাশে রাজরানির মতো গা ভাসিয়ে দিয়েছে সেই কুকুর, দুধের ঢেউয়ের দোলায় দুলছে তার স্ফীত ওলান।#